279342 - শিশুদের জেদ দমন করার সর্বোত্তম উপায়

প্রশ্ন

প্রশ্নটি আমার দুই মেয়ে সংক্রান্ত। একজনের বয়স চার বছর, অন্য জনের বয়স দুই বছর। এদেরকে বড় করে তুলতে আমি বড় ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছি। আমি তাদের সাথে যতই নম্র হয়ে কথা বলতে চাই শেষে পর্যন্ত আমি চিৎকার করি, মারি বা এমন কিছু কথা বলে ফেলি যেগুলো বলতে চাই না। তারপর আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মেয়ে দু'টি কথা শুনতে চায় না। বড় মেয়েকে কিছু বললে সে আমার অধিকাংশ কথার জবাব দেয়। আর ছোট মেয়েও তার সাথে জেদ ধরতে শুরু করেছে। এতে আমার রাগ উঠে যায়। উল্লেখ্য, আমি বিশেষ কিছু কঠিন মুহূর্ত পার করছি, যে কারণে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গিয়েছে। এর সমাধান কী? আমি কীভাবে মেয়েদেরকে অনুগত করে তুলতে পারি? কীভাবে নিজেকে আরো ধৈর্যশীল করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সাধারণভাবে সন্তান প্রতিপালন, বিশেষতঃ কন্যাসন্তান লালন-পালনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ তৌফিকের প্রয়োজন।

আগের যামানায় বলা হতো: "শাসন পিতামাতার পক্ষ থেকে, আর দ্বীনদারিতা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" [ইবনু মুফলিহের 'আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ' (৩/৫৫২)]

এটি সন্তান প্রতিপালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। অনেকে বাবা-মা মনে করেন যে, তারা নিজেদের শিক্ষাদানের কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক যোগ্যতার মাধ্যমে সন্তানদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবেন! তারা মনে করেন, সন্তানদেরকে সেরা স্কুলে ভর্তি করিয়ে, সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা দিয়ে এবং সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিয়ে তারা সন্তানদের মন-মানসিকতা ও আচরণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

এটি মারাত্মক ভুল!

হ্যাঁ, পিতামাতার দায়িত্ব হলো ভালো ও উপকারী সব শিক্ষামূলক উপায় অবলম্বন করা।

কিন্তু বড় বিপদ তখনই, যখন বাবা-মা এসব উপায়ের উপরই পুরোপুরি ভরসা করে বসেন এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ছেড়ে

দেন।

কারণ মানুষকে যদি আল্লাহ তার নিজের ওপর ছেড়ে দেন, তখন সে পথভ্রষ্ট হয়। আর যদি তাকে তার জ্ঞানের ওপর ছেড়ে দেন, তখন সে লাঞ্ছিত হয়।

এ বিষয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁকেও আমাদের রব বলছেন:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

“আপনি যাকে পছন্দ করেন (ইচ্ছা করলেই) তাকে সুপথে আনতে পারবেন না; বরং আল্লাহই যাকে চান সুপথে আনেন।”[সূরা কাসাস: ৫৬]

এছাড়া আল্লাহর নবী নূহ আলাইহিস সালাম নিজ পুত্রকে রক্ষা করতে পারেননি। এক পর্যায়ে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তিনি দোয়া করে বলছিলেন:

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

“হে আমার প্রভু! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা তো সত্য। আপনি হলেন সবচেয়ে বিজ্ঞ বিচারক।”[সূরা হূদ: ৪৫]

তখন আল্লাহ বললেন:

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

“হে নূহ! আসলে সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। এই প্রার্থনা অসৎকর্ম। অতএব, তুমি আমার কাছে এমন কিছু চেয়ো না যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হতে উপদেশ দিচ্ছি।”[সূরা হূদ: ৪৬]

তাই প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

“হে চিরঞ্জীব ও অস্তিত্বের ধারক! আপনার রহমতের অসীলায় বিপদমুক্তি চাই। আমার আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না।”[হাদীসটি হাকেম বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামি' (৫৮২০) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

হে আল্লাহর বান্দী! এই মহান ভাবটি নিয়ে চিন্তা করুন। যে সম্পর্কে আজকাল অনেকে পিতামাতা বেখবর:

আমরা যেন সন্তান পালনে নিজেদের ওপর নির্ভর না করি, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করি।

বরং নির্ভর করি মজবুত স্তম্ভের উপর, আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষাদাতার উপর, বিপদে আশ্রয়স্থলের উপর, সাহায্যকারীর উপর, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালুর উপর।

কারণ একমাত্র তিনিই অন্তরসমূহের মালিক। তিনি অন্তরগুলোকে যেভাবে চান সেভাবে তা ঘুরিয়ে দেন। বান্দাদের কপোল (নিয়ন্ত্রণ) তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। তিনি পরম পবিত্র, তিনি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।

এ বিষয়ে অনুসৃত সর্বাধিক কার্যকরী অন্যতম উপায় হলো: প্রজ্ঞা সহকারে, ধৈর্যের সাথে ও শান্তভাবে বাচ্চাদের জেদকে মোকাবিলা করা।

কারণ জেদের মোকাবিলা জেদ দিয়ে করলে তা কেবল জেদকে আরও বাড়িয়ে দেয়!!

এটি যেন দড়ি টানাটানির খেলার মতো। একপক্ষ যত বেশি টানে অপরপক্ষও তত বেশি টানতে উৎসাহিত হয়।

কিন্তু, মা যদি শিশুর সামনে দড়ির প্রান্ত ছেড়ে দেন, অর্থাৎ তাকে প্রতিযোগিতা ও চ্যালেঞ্জের ভাষায় মোকাবিলা না করেন, তবে শিশুর জেদ দুর্বল হয়ে যায় এবং সে ক্ষতিকর আচরণ থেকে বিরত হতে শুরু করে।

জেদী শিশু সাধারণত বুদ্ধিমান হয় এবং নিজের ইচ্ছা পূরণে সার্বক্ষণিক কৌশলী হয়।

সাধারণতঃ সে নিজেকে আশপাশের মানুষদের তথা ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা, দাদা-দাদীর দ্বারা নিপীড়িত মনে করে। কারণ তারা তাকে অতিরিক্ত সমালোচনা করে ও তার প্রতি কঠোর আচরণ করে। ফলে তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না।

এই দু'টি বিষয় একত্রে তাকে মানসিকভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ও প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে।

এটি সাধারণত সমাজের নিয়ম-নীতির প্রতি জেদী মনোভাব ও বিদ্রোহী আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

অতএব, এ অবস্থায় আপনার করণীয় হলো:

উপেক্ষা ও ক্ষমার মাধ্যমে তার কৌশলের মোকাবিলা করা।

সহানুভূতি ও মমতার মাধ্যমে তার নিপীড়ন বোধের মোকাবিলা করা।

তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা ও তার সংশোধনের প্রতি আন্তরিক সদিচ্ছা দেখানোর মাধ্যমে তার বিদ্রোহী আচরণের মোকাবিলা করা।

তবে প্রয়োজনীয় শাসনমূলক অবস্থান নিতে হবে; কিন্তু আচরণের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি ছাড়া।

জেনে রাখুন, দু'টি জিনিস বর্জন করা ও দু'টি জিনিস গ্রহণ করা ছাড়া শিশুদেরকে আপন করে নেওয়া সম্ভবপর নয়;

যে দু'টি বিষয় বর্জন করতে হবে:

- মৌখিক নির্যাতন
- শারীরিক নির্যাতন

যে দু'টি বিষয় গ্রহণ করতে হবে:

- মৌখিক স্নেহ
- শারীরিক স্নেহ

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

মৌখিক নির্যাতন: এটি প্রত্যেকে মানহানিকর শব্দ দিয়ে সংঘটিত হয়। যে শব্দ দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা হয়; তার কাজকে নয়। যেমন: তাকে অলস/অগোছালো, মিথ্যুক, উগ্র ইত্যাদি নেতিবাচক গুণে অভিযুক্ত করা।

এ ধরণের নেতিবাচক পরিস্থিতিতে শিশুর প্রতি স্নেহ বজায় রাখার জন্য করনীয় হলো: কেবল শিশুর কর্মকে নেতিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করা; সাথে সাথে শিশুকে এর বিপরীত ভালো গুণে অভিহিত করা।

যেমন:
"তুমি অগোছালো" না বলে আমরা তাকে বলব: "তুমি তো গোছানো মানুষ, তাহলে তুমি এমন আচরণ কীভাবে করলে যাতে অবহেলা রয়েছে?"

"তুমি মিথ্যাবাদী" না বলে আমরা তাকে বলব: "তুমি তো সত্যবাদী; তাহলে এমন কথা কীভাবে বললে যা ঘটেনি?"

"তুমি উগ্র" না বলে আমরা তাকে বলব: "তুমি তো স্নেহশীল, কিন্তু, নিজের ভাইকে কীভাবে উগ্রভাবে মারলে?!"

এভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রে করবে।

<u>শারীরিক নির্যাতন:</u> প্রত্যেকে অপমানজনক শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে এটি ঘটে। যার পিছনে উদ্দেশ্য হয় কষ্ট দেওয়া ও প্রতিশোধ নেওয়া। যেমন: এমন মারাত্মকভাবে প্রহার করা, যা শরীয়তসম্মত শাসনমূলক প্রহারের সীমা ছাড়িয়ে কষ্ট ও প্রতিশোধের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কেননা শরীয়তে প্রহারের স্তর তিনটি:

সর্বনিম্ন স্তর: শাসনমূলক প্রহার।

সর্বোচ্চ স্তর: হদ্দ বা আইনী দণ্ড।

মধ্যবর্তী স্তর: বিচারক কর্তৃক শাস্তিমূলক প্রহার।

আমরা যদি সর্বোচ্চ স্তর তথা আইনী দণ্ডের প্রহার নিয়ে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব যে, এতে এমন শরয়ি শর্তবিধি আছে, যা আমাদের যুগে বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে যেভাবে মারধর করে তার চেয়ে অনেকে হালকা ও নিয়ন্ত্রিত!

ফকীহরা (ইসলামী আইনজ্ঞরা) বলেন: সুস্থ শক্তিশালী ব্যক্তিকে আইনী দণ্ডের ক্ষেত্রে মাঝারি ধরনের বেত দিয়ে মারা হবে। বেতটি ভিজো হবে না, অতিরিক্ত শুকনোও হবে না এবং এত হালকা হবে না যে ব্যথাই লাগে না, আবার এত মোটা হবে না যে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

তারা আরও শর্ত আরোপ করেন যে, প্রহারকারী তার হাত মাথার ওপর এত বেশি তুলবে না যে, তার বগলের সাদা অংশ দেখা যায়। প্রহারকারী শরীরের প্রাণঘাতী অঙ্গগুলো এড়িয়ে প্রহার করবে এবং বেতগুলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিবে। তারা একমত যে, মুখে, লজ্জাস্থানে ও প্রাণঘাতী অঙ্গগুলোতে প্রহার করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে দেখুন: হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন (৩/১৪৭), যুরকানী (৮/১১৪), রাওদা (১০/১৭২), আল-মুগনী (৮/৩১৩-৩১৫)।

এই যদি হয় বেত্রাঘাত দণ্ড (জালদ)-এর ক্ষেত্রে আরোপকৃত শর্তাবলী, যেটা প্রহারের সর্বোচ্চ স্তর তাহলে শাসনমূলক প্রহারের ব্যাপারে কী ধারণা করা যায়?!

শাসনমূলক প্রহার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“তোমরা যে নারীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে (প্রথমে) উপদেশ দাও, (তাতে কাজ না হলে) বিছানায় তাদেরকে

বর্জন করো এবং (তাতেও ফল না দিলে) তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বস্থিত, সুমহান।'[সূরা নিসা: ৩৪]

কুরতুবী তার তাফসীরে (৫/১৭২) বলেন: "এই আয়াতে যে প্রহারের কথা বলা হয়েছে তা হলো শাসনমূলক, যা অ-মারাত্মক। যাতে কোনো হাড় ভাঙে না, কোনো অঙ্গকে বিকৃত করে না; যেমন হালকা কিল বা অনুরূপ কিছু দেওয়া। কারণ এ প্রহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে: কেবল সংশোধন করা; অন্য কিছু নয়।

সুতরাং যদি এই প্রহারে মৃত্যু ঘটে তাহলে নিঃসন্দেহে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ কথা এমন শিক্ষকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে কুরআন শেখানো ও আদব শেখানোর জন্য তার ছাত্রকে মারে।

সহীহ মুসলিমে আছে: 'স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা আল্লাহর আমানতের (অঙ্গীকারের) মাধ্যমে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে (শরিয়তের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান ভোগ করা বৈধ করেছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য অধিকার হলো: তারা তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদের বিছানায় বসতে দিবে না। যদি তারা সেটি করে তাহলে তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করো যা কষ্টদায়ক নয়।'[ইমাম মুসলিম হজ্জ সংক্রান্ত দীর্ঘ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদীসে এটি বর্ণনা করেছেন]

তারপর তিনি বলেন:

"আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেসে করলাম: 'অ-মারাত্মক প্রহার কী?' তিনি বললেন: 'মিসওয়াক বা অনুরূপ কিছু দিয়ে প্রহার করা।'" এটি ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

শারীরিক বা মৌখিক নির্যাতনের গ্রহণযোগ্য বিকল্প হলো: বঞ্চনার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া।

এখানে বঞ্চনা বলতে বোঝানো হয়েছে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত "শিক্ষামূলক" বঞ্চনা; উন্মুক্ত বা সীমাহীন বঞ্চনা নয়।

যেমন: শিশুকে দশ মিনিট খেলাধুলা করতে না-দেওয়া। এটি একটি নিয়ন্ত্রিত শিক্ষামূলক বঞ্চনা। যার উদ্দেশ্য তার আচরণকে সংশোধন করার জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করা।

শিশুকে তার বয়স অনুপাতিক সময় "শাস্তির চেয়ারে" বসিয়ে রাখা (যেমন: দশ বছরের বাচ্চাকে = দশ মিনিট) এটিও শিক্ষামূলক বঞ্চনার একটি রূপ।

শিশুর দৈনিক হাতখরচ থেকে নির্দিষ্ট অল্প অংশ কেটে নেওয়াও। এটাও এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষামূলক বঞ্চনা।

কিন্তু যদি শিশুকে একদিন বা তারও বেশি সময় খেলাধুলা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় অথবা যদি তার পুরো হাতখরচ

বন্ধ করে দেওয়া হলো তাকে শাস্তির সাথে মানিয়ে নেয়ার একটি প্রক্রিয়া। বারবার এমনটা করা হলে শিশুটি খুব দ্রুতই এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বঞ্চনার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হলে সে ধীরে ধীরে বিকল্প পথ খুঁজে নেয়।

এছাড়াও ইতিবাচক ও নেতিবাচক কাজের জন্য শিশুর সাথে ‘স্টার চার্ট’ ব্যবহার করা খুবই উপকারী।

যেমন: প্রতিটি ভালো আচরণের জন্য তাকে এক বা একাধিক ‘স্টার’ দেওয়া। প্রতিটি খারাপ আচরণের জন্য এক বা একাধিক ‘স্টার’ কেটে নেওয়া।

পাশাপাশি ‘স্টারগুলোর’ জন্য নিয়ম নির্ধারণ করা: যেমন: দশটি ‘স্টার’ পূর্ণ হলে একটি উপহার। বিশটি ‘স্টার’ পূর্ণ হলে একটি বিনোদনমূলক ভ্রমণ। এভাবে ধাপে ধাপে।

মৌখিক স্নেহ: তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

প্রথমত:

ভালোবাসা ও আবেগমুলক কথা বলা। যেমন আপনার মেয়েদেরকে বলবেন: “আমি তোমাকে ভালোবাসি” এবং এ ধরনের অন্য যে কোনো কথা।

কারণ ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করা এমন একটি বিষয়, যার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন।

আবু কারীমা মিকদাম ইবনু মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যখন কেউ তার ভাইকে ভালোবাসে, তখন সে যেনে তাকে জানিয়ে দেয়ে যে সে তাকে ভালোবাসে।’[হাদীসটি আবু দাউদ (৫১২৪) ও তিরমিযী (২৩৯২) বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

এ ভালোবাসা প্রকাশ হওয়া উচিত দৈনন্দিন, নিয়মিত ও উন্মুক্তভাবে। কোনো বিশেষ মৌসুম, উপলক্ষ বা বাবা-মায়ের পছন্দনীয় আচরণের শর্তে নয়।

দ্বিতীয়ত:

কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করা; এমনকি খুব ছোট্ট কাজের জন্যও। কারণ অনবরত সমালোচনা করা ও অপমানজনক কথা বলা শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়।

তৃতীয়ত:

সমর্থন ও উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা বলা। তার বিশেষ দক্ষতা বা সাধারণ কাজকর্মে তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং মানসিকভাবে তাকে প্রেরণা দেওয়া; যাতে সে তা চালিয়ে যেতে ও উন্নত করতে পারে।

শারীরিক স্নেহ: এটি তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে:

প্রথমত:

কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা আচরণের শর্ত ছাড়াই ছাড়াই শিশুকে কোলে নেওয়া, বুকে জড়িয়ে ধরা। যেমনভাবে ইতিপূর্বে শর্তহীনভাবে ভালোবাসা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।

এটি শিশুদের আবেগগত অস্থিরতা কমাতে ও তাদেরকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল রাখতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয়ত:

ইতিবাচক শারীরিক স্পর্শ। যেমন তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, কাঁধে আলতো চাপড় দেওয়া এবং এই জাতীয় অন্যান্য ইতিবাচক স্পর্শের মাধ্যমগুলো। এগুলো সেসব নেতিবাচক স্পর্শের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে, যেগুলো সাধারণত সন্তানের জেদ ও নেতিবাচক আচরণের সময় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশি প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তৃতীয়ত:

মানসিক ও শারীরিকভাবে তাদের সাথে অংশগ্রহণ। মানসিকভাবে: তাদের কাজ, শখ ও দক্ষতার দিকে আগ্রহ ও প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকানো।

শারীরিকভাবে: তাদের খেলাধুলা, আনন্দ, গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আনন্দের কাজে বাস্তবে অংশগ্রহণ করা।

আমরা আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি শিশু-কিশোরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের কিছু নমুনা দিয়ে:

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠালেন। আমি বললাম: ‘আল্লাহর কসম, আমি যাব না।’ কিন্তু, আমার মনে ছিল আমি যাব; আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন। তখনই আমি বের হয়ে গেলাম। যাওয়ার সময় বাজারে খেলতে থাকা কিছু শিশুর কাছে গেলাম। হঠাৎ দেখি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে আমার ঘাড় ধরে ফেললেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তখন তিনি হাসছিলেন। তিনি বললেন: ‘হে উনাইস (আনাস স্নেহপ্রকাশে ক্ষুদ্রতাজ্ঞাপক শব্দে ‘উনাইস’ বলছেন)! আমি তোমাকে যেখানে পাঠিয়েছিলাম তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে?’
তিনি বলেন: আমি বললাম: ‘হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! আমি যাচ্ছি।’”[হাদীসটি মুসলিম (২৩১০) বর্ণনা করেন]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন: “আমি দশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম, তিনি কখনো আমাকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলেননি। কোনো কাজের জন্য কখনো বলেননি: ‘তুমি কেন এমন করলে?’ অথবা ‘এভাবে করলে না কেন?’”[হাদীসটি বুখারী (৬০৩৮) ও মুসলিম (২৩০৯) বর্ণনা করেন]

এই ছিল খাদেমের সাথে তাঁর আচরণ। ... তাহলে নিজের সন্তানের সঙ্গে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, সেটি কল্পনা করুন!?

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “এক রাতে এশার নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোলে নিয়ে বের হলেন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর নামায শুরু করলেন। নামাযের সময় তিনি একটি সিজদা খুব দীর্ঘ করলেন। আমার বাবা বলেন: আমি মাথা তুলে একটু দেখলাম শিশুটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে চড়ে বসে আছে, আর তিনি সিজদায় পড়ে আছেন। আমি আবার সিজদায় ফিরে গেলাম। নামায শেষে হলে লোকেরা বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন দীর্ঘ সিজদা করলেন যে আমরা ভাবলাম হয়তো কিছু ঘটেছে, অথবা আপনার প্রতি ওহী নাজিল হচ্ছে!’

তিনি বললেন: ‘এর কোনোটাই হয়নি; বরং আমার বৎস (নাতি) আমার পিঠে চড়েছিল। আমি তাকে তাড়াহুড়া করে নামাতে পছন্দ করিনি, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ করে।’”[হাদীসটি নাসাঈ (১১৪১) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন]

এর থেকে বোঝা যায়, শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ; এমনকি সেটা সুমহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর ইবাদতের সময়টাতেও।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি: তিনি যেন আমাদের সন্তানদেরকে নেককার বানিয়ে দেন, আমাদেরকে তাদের সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ করা ও তাদের আমানত আদায় করার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা দান করেন এবং রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তিনি মহান ও পবিত্র।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।